ইয়াসির ক্বাদি

কুরআনিক দুআ

অনুবাদ

আলী আহমাদ মাবরুর

কুরআনিক দুআ

মূল : ইয়াসির ক্বাদি
অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

প্রকাশকের কথা

ধরুন, আপনি একটা মসজিদ কমিটির সভাপতি। মসজিদের উন্নয়ন বরাদ্দ নিতে স্থানীয় সংসদ সদস্য বরাবর একটি আবেদন পেশ করলেন। আবেদনপত্র দেখে এমপি সাহেব আপনাকে তার দফতরে ডেকে নিলেন। তিনি আপনাকে জানালেন, আবেদনপত্রে কিছু ভুল আছে এবং নতুন করে আবেদন করার তাগিদ দিলেন। শুধু তাই নয়; নতুন আবেদনপত্রে কী কী লিখতে হবে, তা এমপি সাহেব নিজেই শিখিয়ে দিলেন। এমপি সাহেবের নির্দেশনানুসারে নতুন আবেদনপত্র লিখলেন। এখন বলুন তো, এই আবেদন গৃহীত হবে কি না? নিশ্চয় আপনি বলবেন, আবেদন গৃহীত হবে। কারণ, যিনি গ্রহণ করবেন, তিনিই শিখিয়ে দিয়েছেন—কীভাবে আবেদন করতে হবে। আর তিনি কিছু বরাদ্দ দেবেন মনস্থির করেই তো নতুন করে আবেদন করার প্রক্রিয়া শিখিয়ে দিয়েছেন, তাই নয় কি?

সুবহানআল্লাহ! এই পৃথিবীর কর্ণধার আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে আমরা অনেক আবেদন করি, ভিক্ষা চাই। আমাদের চাওয়ার মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি কিংবা অপূর্ণতা থাকার সম্ভাবনা প্রবল। তাই মহান দাতা, রাজাধিরাজ আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা নিজেই আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন—কীভাবে তাঁর কাছে চাইতে হবে, কীভাবে আবেদন পেশ করতে হবে। আল্লাহু আকবার! এই আবেদন মঞ্জুর না হয়ে পারে না। কারণ, তিনি নিজেই আবেদনের কথামালা বান্দাকে শিখিয়ে দিয়েছেন। রাব্বুল আলামিনের শিখিয়ে দেওয়া আবেদনের ভাষাকেই আমরা বলছি 'কুরআনিক দুআ'।

কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাকে অনুপম কিছু দুআ শিখিয়ে দিয়েছেন। তিনি জানেন, আমরা দুর্বলচিত্তের ঈমানদার, অসহায় মুমিন, অবুঝ গুনাহগার, আমলে দৈন্য। তিনি যেন আমাদের বলছেন—'হে আমার বান্দারা! তোমরা আমাকে এভাবে... এভাবে... বলো, এভাবে চাও, আর আমি তোমাদের দিয়ে দেবো।'

এই দেখুন না, সূরা বাকারার ২৮৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের কুরআনিক দুআ শিখিয়ে দিচ্ছেন কী অনুপম ভাষায়! তিনি যেন বলছেন—'হে মানুষ! তোমরা আমার কাছে এমন করে করে চাও—

> "হে আমাদের পালনকর্তা! যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদের অপরাধী কোরো না। হে আমাদের পালনকর্তা! এবং আমাদের ওপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর অর্পণ করেছ। হে আমাদের প্রভু! এবং আমাদের দ্বারা ওই বোঝা বহন করিয়ো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন করো, আমাদের ক্ষমা করো এবং আমাদের প্রতি দয়া করো। তুমিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো।"' সূরা বাকারা : ২৮৬

একবার ভাবুন তো, কেমন শক্তিশালী এই শব্দমালা! সুবহানআল্লাহ! কুরআনিক দুআর প্রতিটি শব্দ ও বাক্য আমাদের জন্য বিশেষ নিয়ামত। কী দারুণ হৃদয়গ্রাহী ভাষা! কী হৃদয়স্পর্শী আকুতি-মিনতি! এমন করে অসংখ্য কুরআনিক দুআ নিয়ে অসাধারণ আলোচনা করেছেন এই সময়ের অন্যতম সেরা দায়ি ইলাল্লাহ ও স্কলার শাইখ ড. ইয়াসির ক্বাদি তাঁর ধারাবাহিক বক্তব্য Quranic Dua's সিরিজ-এ। কুরআনিক দুআর প্রেক্ষাপট এবং আগে-পিছে ঘটনা-প্রবাহ আর প্রয়োগবিধি নিয়ে দারুণ এক আলোচনা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। এই বইটি পড়ার পর আপনার অনুভূতি বদলে যাবে, নিশ্চিত থাকুন। বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন এই সময়ের অন্যতম সেরা অনুবাদক জনাব আলী আহমাদ মাবরুর। পাঠকবৃন্দ একটি উপকারী গ্রন্থ হাতে পাচ্ছেন, ইনশাআল্লাহ। সম্মানিত লেখক, অনুবাদক এবং বইটির নির্মাণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের আরজি ও মিনতি কবুল করুন। অসীম জীবনে তাঁর রহমতের চাদরে আবৃত রাখুন।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা
২৫ নভেম্বর, ২০২০

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহর অশেষ রহমতে ড. ইয়াসির ক্বাদির একটি অনবদ্য আলোচনা 'কুরআনিক দুআ'র বাংলা ভাষায় অনুবাদের কাজটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হলাম। ২০১৯ সালের রমজান মাসে তিনি এই আলোচনাটি করেছিলেন। আমি তখন দুই-একটি পর্ব শুনেছিলাম, আর তারপর থেকেই আমি এই আলোচনাকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার জন্য চেষ্টা করতে থাকি।

আলহামদুলিল্লাহ! বর্তমানে আমাদের দেশে দুআ ও জিকিরের প্রচুর বই পাওয়া যায়। আমি এ রকম বেশ কয়েকটি বই দেখেছি। কিন্তু এই আলোচনাটি সেসব থেকে অনেকটাই আলাদা। এখানে দুআকে নিয়ে যেমন কথা বলা হয়েছে, ঠিক একইভাবে দুআর প্রেক্ষাপট, দুআর অর্থ, কখন কোন দুআ করতে হবে—তা নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। আমি এই বইটির কাজ করতে গিয়ে যেমন নতুন কিছু দুআ শিখেছি, আবার একইভাবে জানা দুআগুলোকেও নতুন করে আবিষ্কার করতে পেরেছি। দুআ ও দুআর ফলাফল বিষয়ে আমার আস্থাও আগের তুলনায় অনেকটুকু বেড়েছে।

আমরা বর্তমানে নানাবিধ সমস্যা মোকাবিলা করছি। মহামারি করোনার ছোবলে গোটা মানবজাতি এখন বিপর্যস্ত। শারীরিক ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি অন্যান্য ক্ষতির প্রকটতাও এখন দৃশ্যমান। এই রকম একটি পরিস্থিতিতে নিজের চেষ্টার সাথে সাথে রবের কাছে নিয়মিত দুআ করাও একান্তভাবে প্রয়োজন। এই ধরনের দুর্যোগ বা সংকট ব্যক্তিগত উদ্যোগে বা প্রচেষ্টায় অতিক্রম করা আমাদের জন্য কঠিন। আল্লাহ তায়ালার রহমত আমাদের সব সময় পাথেয়।

দুআ আমরা যেকোনো অবস্থায় করতে পারি। নিজের ভাষায়ও দুআ করা উত্তম। কিন্তু তারপরও এই বইতে আলোচ্য দুআগুলোর ফজিলত অনেক বেশি। কারণ, এগুলো আল কুরআনের দুআ। আল্লাহ নিজে বিভিন্ন ঘটনা, বিভিন্ন নবির ইতিহাস, বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের বর্ণনাগাঁথা উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে এই দুআগুলোকে সর্বশেষ আসমানি কিতাবে সংরক্ষণ করেছেন—যাতে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষেরা তা আমল করে যেতে পারে।

দুআ বিশ্বাসীদের হাতিয়ার। কিন্তু সঠিক সময়ে সঠিক দুআটি না জানায় আমরা অনেক সময় যথাযথভাবে হাত তুলতেও পারি না। কীভাবে দুআ করলে দুআ কবুলের সম্ভাবনা বেড়ে যায়, তা নিয়েও আমরা অন্ধকারে থাকি। এই সব জরুরি বিষয়গুলোও এই বইটিতে লিপিবদ্ধ পাওয়া যাবে, ইনশাআল্লাহ! পাঠকেরা যদি বইটি পড়ে আল্লাহর কাছে চাওয়ার বিষয়ে আরও বেশি আস্থাশীল ও অনুশীলনকারী হয়ে উঠতে পারে, তাহলেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হয়ে উঠবে।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে এই কুরআনিক দুআগুলো আমল করার তাওফিক দিন। আমিন!

আলী আহমাদ মাবরুর
উত্তরা, ঢাকা

সূচিপত্র

হজরত আদম ﷺ-এর দুআ	১১
পুনরাবৃত্তির দুআ	১৮
যে দুআয় মিরাকল ঘটে	২৬
নবিজি ﷺ যে দুআটি বারবার পড়তেন	৩৩
অন্তর পরিষ্কারের দুআ	৪০
দুআ করার উৎকৃষ্ট সময়	৪৭
জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দুআ	৫১
ধৈর্যধারণ করার দুআ	৫৭
দৃঢ়চেতা ও বলিষ্ঠ থাকার দুআ	৬২
হজরত মুসা ﷺ-এর দুআ	৬৯
হজরত জাকারিয়া ﷺ-এর দুআ	৭৭
দুআ কবুলের বিষয়ে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি	৮৪
শয়তানের চক্রান্ত থেকে সুরক্ষা পাওয়ার দুআ	৮৭
যে কারণে দুআ কবুল হয় না	৯৪
আমাদের কাফিরদের জন্য পরীক্ষা বানাবেন না	৯৯

প্রশান্ত ও প্রশস্ত অন্তরের জন্য দুআ	১০৫
হিজরতের জন্য নবিজির দুআ	১১২
পিতা-মাতার জন্য দুআ	১১৮
ক্ষমা প্রার্থনায় দুআ	১২৪
সন্তানের জন্য দুআ	১২৬
যে দুআ দিয়ে সূরা বাকারার সমাপ্তি	১৩৫
সূরা আলে ইমরানের দুআ	১৪২
হাসবি আল্লাহ দিয়ে নিরাপত্তা লাভ	১৪৮
আল্লাহ কেন আমাদের দুআ কবুল করেন না	১৫২
হজরত ইবরাহিম ﷺ-এর দুআ	১৫৯

হজরত আদম ﷺ-এর দুআ

শুরুতেই আদি পিতা হজরত আদম ﷺ-এর ঘটনাগুলো স্মরণ করতে আপনাদের অনুরোধ করছি। সুবহানআল্লাহ! তিনি কতটা সৌভাগ্যবান মানুষ ছিলেন! আল্লাহ তায়ালা নিজের পছন্দমতো কাঠামোতে তাঁকে সৃষ্টি করেছেন। হজরত আদম ﷺ আল্লাহকে দেখার এবং তাঁর সাথে সরাসরি কথা বলারও সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর স্বস্তির জন্য সঙ্গিনী হিসেবে মা হাওয়া ﷺ-কেও সৃষ্টি করেছেন। এরপর আল্লাহ তাঁদের জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন। জান্নাতে তাঁরা কত বছর ছিলেন, তা আমরা জানি না। কারণ, জান্নাতে সময়ের কোনো হিসাব নেই। আল্লাহ তাঁদের জান্নাতের সব নিয়ামত পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করারও স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তাঁরা সেখানে যা ইচ্ছা তা-ই খেতে পারতেন, পান করতে পারতেন।

শুধু একটি নিষিদ্ধ গাছের ফল না খেতে আল্লাহ তাঁদের দুজনকে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু আমাদের আদি পিতা আদম ﷺও তো মানুষ ছিলেন, তাই তিনিও মানবিক দুর্বলতার বাইরে ছিলেন না। ফলে ভুল করে ফেললেন। এবার একটু ভাবুন, আল্লাহ তাঁকে সৃষ্টি করলেন, কোনো কিছু চাওয়ার আগেই তাঁকে অফুরন্ত নিয়ামত ও প্রাচুর্যে পূর্ণ জান্নাতে থাকার সুযোগ করে দিলেন, তবুও তিনি ভুল করলেন।

শাস্তি হিসেবে হজরত আদম ﷺ ও মা হাওয়া ﷺ-কে দুনিয়ায় পাঠনো হলো। তাঁরা দুজন পৃথিবীর দুই স্থানে এসে পড়লেন। পৃথিবীতে আসার পর প্রাথমিক দিনগুলোতে আদম ﷺ কিছুই জানতেন না। এখানে তিনি জান্নাতের মতো সবকিছু রেডিমেট পাচ্ছিলেন না। পূর্বে জান্নাতে থাকা অবস্থায় কোনো ধরনের অস্বস্তি ও কষ্টকর অনুভূতির সাথে তিনি পরিচিত ছিলেন না। অথচ পৃথিবীতে আসার পর থেকেই তাঁর জীবনে কষ্ট, নির্যাতন, যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল। জান্নাতে তিনি কখনো ভয় পাননি। অথচ একটি ভুলের কারণে তাঁকে পৃথিবীর কঠিন বাস্তবতার মুখে পড়তে হলো। অন্ধকার রাত্রি বা ভয়ংকর সব প্রাণীর সাথে তাঁকে সহাবস্থানে অভ্যস্ত হতে হলো। সবচেয়ে বড়ো যে কষ্টটি তিনি পাচ্ছিলেন, তা হলো—নিঃসঙ্গতা। গোটা পৃথিবীতে তিনি একা। আর কেউ আছেন কি না, থাকলে কোথায় আছেন, কিছুই তিনি জানতেন না। কোনো মানুষ একবার আনুকূল্য পাওয়ার পর যখন আবারও প্রতিকূলতায় পড়ে যায়, তখন যে ভীষণ কষ্ট হয়, তার প্রথম উদাহরণ ছিলেন হজরত আদম ﷺ।

এখন প্রশ্ন হলো, কীভাবে আদম ﷺ আল্লাহর কাছে ক্ষমা পেলেন? কীভাবে আবার তিনি আল্লাহর করুণাধারায় সিক্ত হওয়ার সুযোগ পেলেন? আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> فَتَلَقّٰٓى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ-
>
> 'অতঃপর হজরত আদম তাঁর পালনকর্তার কাছ থেকে কয়েকটি কথা শিখে নিলেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর প্রতি (করুণাভরে) লক্ষ করলেন। নিশ্চয়ই তিনি মহা ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু।' সূরা বাকারা : ৩৭

হজরত আদম ﷺ আমাদের সবার প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি যা করেছেন, যা অনুভব করেছেন, আমরা মানুষ হিসেবে তারই ধারাবাহিকতা পালন করে থাকি। তাই যখনই আমরা কোনো অপরাধ করব, আমাদের উচিত আদি পিতা হজরত আদম ﷺ-এর কথা স্মরণ করা; কীভাবে তিনি অনুতপ্ত হয়েছিলেন, তওবা করেছিলেন, সেই প্রক্রিয়াগুলো অনুশীলন করা।

আল্লাহ আমাদেরও অসংখ্য নিয়ামত দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এই পৃথিবীতে চলার পথে প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা আল্লাহর করুণা ভোগ করি। এরপরও আমরা আল্লাহকে ভুলে যাই, নাফরমানি করি, পাপে লিপ্ত হই। এখান থেকে আমরা কীভাবে উত্তরণ পেতে পারি, তা-ও শিখব হজরত আদম ﷺ-এর ঘটনা থেকেই।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, তিনি আদম ﷺ-কে কিছু কথা শিখিয়ে দিয়েছিলেন। মূলত এই কথাগুলোই হলো দুআ। আল্লাহ তায়ালা বিশেষভাবে যে দুআটি শিখিয়েছিলেন, তা উল্লেখ করা হয়েছে সূরা আল আরাফে—

> رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ-
>
> 'হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায়-জুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন, তাহলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।' সূরা আ'রাফ : ২৩

এই দুআটাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের আদি পিতাকে শিখিয়েছিলেন। এ কারণে দুআটি দিয়েই এই অধ্যায় শুরু করছি। এই অধ্যায়ে আরও বেশ কয়েকটি দুআ, সেগুলোর প্রেক্ষাপট ও ফজিলত নিয়েও আলোচনা করব। তবে এ বইটিতে মূলত সেই দুআগুলো নিয়েই আলোচনা করব, যেগুলো সরাসরি আল কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে এমনটা বলাও অত্যুক্তি হবে না যে, এই দুআই ছিল পৃথিবীতে হজরত আদম ﷺ-এর প্রথম ইবাদত। তখনও নামাজ পড়ার বিধান জারি হয়নি। জাকাত বা হজের মতো আমলগুলো পালন করারও কোনো সুযোগ ছিল না। রোজা রাখার বিধান তখন পর্যন্ত প্রবর্তিত হয়নি। এমনই এক বাস্তবতায় সবকিছুর আগে হজরত আদম ﷺ ও হজরত হাওয়া ﷺ এই দুআটিই বারবার পাঠ করছিলেন। এ কারণে দুআকে মানুষের প্রথম ও প্রাথমিক ইবাদত হিসেবেও গণ্য করা যায়। হজরত আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন—

> ‘দুআই হচ্ছে ইবাদতের সারবস্তু।’ তিরমিজি

আল্লাহ বলেন—

> وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ۭ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ-
>
> ‘তোমরা আমাকে ডাকো দুআর মাধ্যমে, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো। যারা আমার ইবাদতে অহংকার করে, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।’ সূরা মুমিন : ৬০

এই আয়াতটি লক্ষ করুন। মহান আল্লাহ আয়াতটি শুরু করেছেন দুআর কথা বলে, আর শেষ করেছেন ইবাদতের প্রসঙ্গ ধরে। দুআ আর ইবাদত পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত। প্রকৃত ঈমানদাররা আল্লাহর কাছে দুআ করতে কখনোই ভুল করে না। আরেকটি বিষয় হলো, দুআর বিষয়টি রমজান মাসের সাথেও সম্পর্কিত। আল্লাহ তায়ালা রোজাকে ফরজ করেছেন সূরা বাকারার ১৮৩ নং আয়াত দিয়ে। সূরা বাকারার এই আয়াত থেকে পরবর্তী ১৮৭ নং আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ রমজান মাসের ফজিলত ও বিধানগুলো বর্ণনা করেছেন। অথচ এই আয়াতগুলোর মাঝখানে ১৮৬ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন—

> وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ ۭ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ-
>
> ‘আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে, তাদের জানিয়ে দাও—বস্তুত আমি রয়েছি তাদের খুবই নিকটে। যারা দুআ করে, আমি তাদের দুআ কবুল করে নিই। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য—যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।’ সূরা বাকারা : ১৮৬

এ কারণে সারা বছর তো বটেই, বিশেষ করে রমজান মাসে আমাদের দুআর পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। কুরআনের দুআগুলোর তাৎপর্য হলো, স্বয়ং আল্লাহই আমাদের এই দুআগুলো শিখিয়ে দিচ্ছেন। একটু চিন্তা করে দেখুন, যে আদম ﷺ আল্লাহর হুকুম অমান্য করলেন, সেই আল্লাহই আবার তাঁকে দুআ শিখিয়ে দিলেন—যাতে এই দুআটি আমল করার মাধ্যমে তিনি ভুলের দায় থেকে মুক্ত হতে পারেন। অর্থাৎ আল্লাহই তাঁকে ক্ষমা পাওয়ার উপায় বাতলে দিয়েছেন।

এই ঘটনাটি আমাদের জন্যও অনেক বেশি স্বস্তির ও প্রশান্তির। এর মাধ্যমে বুঝতে পারি—যে মহান সত্তার প্রতি আমরা অন্যায় করেছি, তিনি তা ধরে রাখেন না; বরং ক্ষমা করতে ভালোবাসেন। তিনি চান, আমরা তাঁর কাছে ক্ষমা চাই। আর আমরা তাঁর দিকে একটু এগিয়ে গেলেই তিনি আমাদের ক্ষমা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন। তাই আমাদের বেশি বেশি করে দুআ পাঠ করা উচিত। বিশেষ করে কুরআনে যে দুআগুলো বর্ণিত আছে, যেগুলো আমাদের পূর্বসূরি নবিরা আমল করে গেছেন এবং আমাদের প্রিয় রাসূলও ﷺ যেগুলো পড়ার তাগিদ দিয়েছেন, সেগুলো মুখস্থ করা প্রয়োজন।

দুআ করার উৎকৃষ্ট সময়

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন—

> ‘যখন তোমার কাছে বান্দা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, (তখন বলে দাও) নিশ্চয়ই আমি তাদের কাছে। প্রার্থনাকারী যখন আমাকে ডাকে, তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিই। সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং ঈমান আনে। আশা করা যায়, তারা সফলকাম হবে।’ সূরা বাকারা : ১৮৬

রাসূল ﷺ দুআ করার জন্য আমাদের বিশেষ কিছু সময়ের কথা জানিয়েছেন। এই সময়গুলোতে দুআ করলে তা কবুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেমন : তিনি বলেছেন—

> ‘জুমার দিন এমন একটি মুহূর্ত আছে, যেই মুহূর্তে বান্দা যা প্রার্থনা করবে, তা-ই তাকে দেওয়া হয়।’ বুখারি : ৬৪০০, মুসলিম : ১৪০৭

এই সময়টা নিয়ে মতান্তর আছে; তবে অধিকাংশ স্কলার মনে করেন, এই সময়টা হলো আসরের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত।

রাসূল ﷺ আরেকটি বর্ণনায় বলেছেন—

> ‘আজান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময় দুআ কবুল হয়। সুতরাং তোমরা দুআ করো।’ মিশকাত : ৬৭১

এই সময়ের দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। তাই যেসব সম্মানিত মুসুল্লিগণ আজানের সময় মসজিদে প্রবেশ করে জামাত শুরু হওয়ার অপেক্ষা করেন, তারা এই সময়টুকু কাজে লাগাতে পারেন। আল্লাহর কাছে খোলা মনে দুআ করতে পারেন।

নামাজের মধ্যেই এমন বেশ কিছু সময় আছে, যখন আমরা দুআ করতে পারি। এই সময়গুলো এতটাই বরকতপূর্ণ যে, তাতে দুআ কবুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। এর মধ্যে সিজদার ভেতরে,

সালাম ফেরানোর আগে ও পরে দুআ করার পক্ষে বেশি মতামত পাওয়া যায়। তবে এই তিনটি সময়ের মধ্যে আবার সিজদার সময়টিকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। রাসূল ﷺ বলেছেন—

> 'সিজদারত বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী। সুতরাং সে সময় বেশি বেশি দুআ করো।' মুসলিম : ৪৮২

এই সময়ে আমরা দুনিয়ার ও আখিরাতের কল্যাণ কামনায় দুআ করব। উল্লেখ্য, আমার শিক্ষকগণ এবং ইসলামের ক্লাসিকাল স্কলাররা এই মতামত দিয়েছেন যে, নামাজরত বান্দা সিজদায় আরবিতে তাসবিহ পাঠ করার পর নিজ মাতৃভাষাসহ যেকোনো ভাষায় আল্লাহর কাছে প্রাণখুলে দুআ করতে পারবে। তিলাওয়াতে এবং নামাজের মধ্যে জিকির-আজকার ও তাসবিহগুলো আরবিতে হতে হবে। কিন্তু অতিরিক্ত দুআগুলো ভিন্ন ভাষায় করারও অবকাশ রয়েছে। যেহেতু এই অতিরিক্ত দুআগুলো ব্যক্তির নিজস্ব, এটা নামাজের অংশ নয়, তাই এখানে অন্য ভাষা ব্যবহার করা যেতেই পারে।

দুআ কবুলের সময় নিয়ে নবিজির ﷺ আরেকটি বর্ণনা আছে। যেখানে তিনি বলেছেন—

> 'তিন ব্যক্তির দুআ কখনো ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। যখন রোজাদার ব্যক্তি ইফতারের মুহূর্তে দুআ করলে, ন্যায়পরায়ণ শাসকের এবং নির্যাতিত ব্যক্তির দুআ।' মুসনাদে আহমাদ, তিরমিজি

অর্থাৎ একজন রোজাদার সারাদিন রোজা রাখার পর যখন ইফতারি সামনে নিয়ে বসে, তখন সে যে দুআগুলো করে, তা ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। তাই রমজান মাসসহ যেকোনো নফল রোজার ক্ষেত্রেই আমাদের সচেতনভাবে এই সময়টুকু দুআ করার কাজে লাগানো উচিত। আমরা যেন খাবারের বর্ণনা, রাজনীতি, গিবত বা পরনিন্দা করতে গিয়ে এই সময়টা নষ্ট না করি। ইফতারির আগের সময়টা দুআ আর জিকিরে ব্যস্ত থাকা উচিত।

দুআ করার আরেকটি বিশেষ দিন হলো লাইলাতুল কদর। এই রাতের দুআর যে শক্তি, তা অন্য কোনো রাতে পাওয়া যায় না। এই একটি রাতের আমল মানুষের এক জীবনের গড় আয়ুর পরিমাণের চেয়েও (৮৩ বছর) বেশি হয়ে যায়। তাই লাইলাতুল কদরের সারা রাত দুআ ও জিকিরের মাধ্যমে অতিবাহিত করা উচিত।

উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়শা ﵂ থেকে বর্ণিত—

> 'আমি রাসূল ﷺ-কে প্রশ্ন করেছিলাম—"হে আল্লাহর রাসূল! যদি জানতে পারি, কোন রাতটি লাইলাতুল কদর, তাহলে আমি কোন দুআটি পাঠ করব?"

প্রিয় নবি কারিম ﷺ বলেন—

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ-

"হে আল্লাহ! আপনি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করতে ভালোবাসেন; অতএব, আমাকে ক্ষমা করে দিন।"' মুত্তাফিকুন আলাইহি, মুসনাদে আহমাদ, ইবনে মাজাহ, তিরমিজি, মিশকাত

دعاء

শয়তানের চক্রান্ত থেকে সুরক্ষা পাওয়ার দুআ

এ অধ্যায়ে যে দুআটি নিয়ে আলোচনা করব, তা সূরা আল মুমিনুনের ৯৭-৯৮ নং আয়াতে লিপিবদ্ধ হয়েছে—

> وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ-
>
> ‘বলুন, হে আমার পালনকর্তা! আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি।’
>
> وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ-
>
> ‘এবং হে আমার পালনকর্তা! আমার নিকট তাদের উপস্থিতি থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি।’

এই দুআ পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয়তম রাসূল ﷺ-কে সরাসরি শিখিয়ে দিয়েছেন। আমরা এই দুআর মাধ্যমে শয়তানের চক্রান্ত ও ওয়াসওয়াসা থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারি। আর কুরআন তিলাওয়াতের আগে শয়তানের প্ররোচনা থেকে মুক্তি চাইতে হয়। অন্যথায়, কুরআনের মর্মার্থ অনেক ক্ষেত্রেই অনুধাবন করা করা সম্ভব হবে না। তাই মহান আল্লাহ তায়ালা কুরআন তিলাওয়াতের সময় শয়তানের প্ররোচনা থেকে মুক্ত থাকার জন্য রাসূল ﷺ-কে নির্দেশনা দিয়েছেন।

> ‘যখন আপনি কুরআন পাঠ করেন, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করুন।’ সূরা আন-নাহল : ৯৮

আর এ কারণেই আমরা কুরআন তিলাওয়াত শুরু করার আগে ‘আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম’ বলে তিলাওয়াত শুরু করি। এ পর্যায়ে আমরা জানার চেষ্টা করব, শয়তানের প্ররোচনা থেকে মুক্ত থাকার তাৎপর্যটা কী? একই সঙ্গে আরও জানার চেষ্টা করব, কেনই-বা আল্লাহ শয়তান নামক এ রকম একটি অনিষ্টকর সত্তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখলেন?

প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) শয়তান সৃষ্টির নেপথ্যে আল্লাহর প্রজ্ঞা পর্যালোচনা করে আলাদা একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর মতে, শয়তান সৃষ্টির প্রথম কারণ হলো—আল্লাহর বৈচিত্র্যময় সৃষ্টি সম্পর্কে আমাদের ধারণা দেওয়া। আল্লাহ যেমন সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও নিষ্কলুষ সৃষ্টি হিসেবে ফেরেশতাদের সৃষ্টি করেছেন, ঠিক তেমনি শয়তানও সৃষ্টি করেছেন।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ শয়তানের মতো একটি পরিষ্কার, স্পষ্ট সত্তাকে সৃষ্টি করেছেন— যাতে মানুষ নিজেদের সুরক্ষা করতে পারে। শয়তান কোনো ধারণা বা চেতনার নাম নয়। শয়তান জীবিত; ঠিক আমরা যেমন, তেমনই। আর এ কারণেই আমাদের প্রতিনিয়ত শয়তানের প্ররোচনা থেকে রক্ষা পেতে চেষ্টা করতে হয়।

মনে করুন, যখন জানতে পারেন আপনার শহরে কেউ আক্রমণ করতে পারে বা কোনো মহামারি আক্রান্ত করতে পারে, তখন কী করেন? তখন নিশ্চয়ই আপনি সচেতন হন, নিজেকে রক্ষা করার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু এ রকম কোনো হুমকি না থাকলে মানুষ হিসেবে আমরা সচেতন থাকব না; একেবারেই বেয়াড়া ও বেহিসাবি জীবনযাপন করব—যা আমাদের জন্য কখনোই কল্যাণকর হবে না।

তাই আল্লাহ শয়তানকে এতটা প্রভাবশালী করে সৃষ্টি করেছেন। শয়তান যেকোনো মানুষকেই পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত করতে পারে। আল্লাহ তায়ালা আল কুরআনে এই প্রসঙ্গে বলেন—

‘হে বনি আদম! শয়তান যেন তোমাদের বিভ্রান্ত না করে; যেমন সে তোমাদের পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে এমতাবস্থায় যে, তাঁদের পোশাক তাঁদের থেকে খুলে দিয়েছে—যাতে তাঁদের লজাস্থান দেখিয়ে দেয়। সে ও তার দলবল তোমাদের দেখে, যেখান থেকে তোমরা তাদের দেখো না।’ সূরা আরাফ : ২৭